XXCE
বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
৯৩ বর্ষ ২১৭ সংখ্যা শনিবার ৮ কার্তিক ১৪২১ কলকাতা

আর কত হারিবেন

মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় কংগ্রেস হারিয়াছে, ইহা কোনও সংবাদই নয়। সংবাদ আসলে, মহারাষ্ট্র কিংবা হরিয়ানায় কংগ্রেস ভোটে লড়েই নাই। আগে হইতে হারিয়া বসিয়া থাকিলে আর লড়িবার দরকার হয় না। কংগ্রেস সেই সিদ্ধান্ত লইয়াছিল। হারিবার আগেই প্রমাণ করিয়াছে যে তাহারা আসলে খেলাতেই ছিল না। ফলে এই দুই নির্বাচনের ফলাফল বাহির হইবার পর নূতন করিয়া কংগ্রেসের মধ্যে আত্মসন্ধান, আত্মসংশোধন ইত্যাদি শুরু হইবে, এমন দুরাশা অর্থহীন। যাহা ঘটে নাই, তাহার জন্য অনুতাপই বা কেন, আর সংশোধনই বা কেন। বরং কংগ্রেসের জন্য অন্য এক রকম ভাবনার সময় আসিয়াছে। একশত ঊনত্রিশ বৎসর পর ভারতের রাজনীতিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছেন, এত বড় সংকট-মুহূর্ত সওয়াশো বৎসরে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞতা করে নাই, কত সংঘর্ষ কত জটিলতা কত ধাক্কা সহিতে হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণত এলেবেলে হইয়া যাইবার এই অনাস্বাদিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার সরল সত্যটি সহজে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা বরং ভাবুন, এই অস্তাচলপানে অনলস যাত্রার রূপরেখাটি কেমন ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। দলের নেতা-নেত্রী মাতা-পুত্র খামখা অন্যান্য বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া এই ব্যাখ্যাটির দিকেই আপাতত মন দিন। তাহাতে তাঁহাদের অবস্থার ইতরবিশেষ হইবে না, তবে কি না, কংগ্রেসের (হয়তো মরণোত্তর) ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের কাজ অন্তত শুরু হইয়া থাকিবে।

দলের অন্দরে নাকি নির্বাচনের ফলাফলের পর নূতন করিয়া নেতা ও নেত্রীর দিকে প্রশ্ন ও সংশয়ের বাণ ধাবিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রে কয়েক বৎসর যাবৎ দলের ছোট নেতারা বলিয়া আসিতেছেন, সমস্যা গভীর, সমাধান জরুরি। বড় নেতারা কান দেন নাই। রাহুল গাঁধী এমনও বলিয়াছেন যে পনেরো বৎসর রাজ্যপাটের পর পরাজয় ঘটিতেই পারে। তাঁহার এই সারল্যে ও ঔদাসীন্যে মরাঠাভূমির কংগ্রেস হতচকিত হইয়া জানিতে চাহিয়াছে, তবে সেই যুক্তিতে গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ বা ওড়িশায় কেন ফল শাসক দলের বিপরীতে গেল না। নীরবতা শুধু হিরণ্ময় হইয়াছে। ইতিমধ্যে চোখ এড়ায় নাই যে, নরেন্দ্র মোদী ও তাঁহার যোগ্য সেনাপতি অমিত শাহ যখন নির্বাচনী যুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া নামিয়াছেন, রাহুল গাঁধী কিন্তু অবিচলিত, অনুদ্বিগ্ন ও নিশ্চেষ্ট।

সুতরাং ‘পরিবার’তন্ত্রের আগল না ঘুচিলে যে আশা নাই, এ আর এখন শুধু বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিদের কথা নয়, দলের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও নেতারাও একমত। প্রশ্ন হইল, পরিবারকে পরিত্যাগেই কি আলোর পথের আশা? লক্ষণীয়, যে রাজ্যে হাইকমান্ড মাথা ঘামান নাই সেখানেও অবস্থা যতটা মন্দ, যে রাজ্যে নেতৃত্বে রদবদল হইয়াছে, সেখানেও তথৈবচ। বিহারে রাহুল গাঁধীর নিজহস্তে নির্বাচিত নেতার বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রতি স্তরে প্রতি অঞ্চলে অভিযোগের পাহাড়। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের শীর্ষনেতা এখনও রাজ্য-রাজনীতিনাট্যে পার্শ্বচরিত্রের অধিকারটুকু পাইবার জন্য দিবারাত্র প্রয়াসী। এবং সেই সুযোগে, তৎসহ সূর্যকান্ত মিশ্র ও তাঁহার সহকর্মীদের অতুলনীয় নিষ্ক্রিয়তার কল্যাণে, শাসক তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতে পশ্চিমবঙ্গে এতকাল কার্যত অস্তিত্বহীন বিজেপিকে কুটোটিও নাড়াইতে হইতেছে না। মহারাষ্ট্রের মতো যে রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার ছিল, সেখানে তাহারা ধুইয়া-মুছিয়া সাফ। ওড়িশার মতো যে রাজ্যে কংগ্রেস ২০০০ সালের পর ক্ষমতার মুখও দেখে নাই, সেখানেও প্রতি নির্বাচনে তাহাদের আসন কমিতে কমিতে তলানিতে। ঠিক ২০০৪ সালে রাহুল গাঁধী কংগ্রেসের মুখ্যমঞ্চে পা রাখিয়াছিলেন। এক দশক আত্মোপলব্ধির যথেষ্ট উপযুক্ত সময়কাল। এ বার সেই উপলব্ধির আলোক তাঁহার ও তাঁহার দলের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবার কোনও আশা আছে কি?

তবু ভাল

সদ্য-বিলুপ্ত শ্যামল সেন কমিশন সম্বন্ধে যত কথা বলিবার, তাহার সবটুকু নেতিবাচক নহে। এই কমিশনের অন্তত একটি ইতিবাচক দিক আছে। তাহা হইল, কমিশনটি আর নাই। এমন অপ্রয়োজনীয়, অনৈতিক, অস্বচ্ছ এবং বিপজ্জনক একটি কমিশন যে তৈরি হইয়াছিল, এবং এত দিন টিকিয়া ছিল, তাহা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অতি দুর্ভাগ্যের। বহু বিলম্বে হইলেও সরকার কমিশনটির ঝাঁপ ফেলিয়াছে, তাহাই বাঁচোয়া। সারদা বা অন্য কোনও ভুঁইফোড় আর্থিক সংস্থায় যাঁহারা টাকা খোয়াইয়াছেন, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের দায় সরকারের নহে। তাঁহাদের অনেকেই দরিদ্র হইলেও নহে। তাঁহারা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ ভোটার হইলেও নহে। এমন জালিয়াত আর্থিক সংস্থার বাড়বাড়ন্ত রোধ করা সরকারের কাজ ছিল। সরকার তাহাতে ব্যর্থ। পক্ষান্তরে, এই সন্দেহ ক্রমশই বাড়িতেছে যে, সেই সংস্থাগুলির ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠায় শাসক দলের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু রাজকোষের টাকা খরচ করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা চলে না। কোনও বেসরকারি সংস্থা এবং কিছু ব্যক্তির মধ্যে হওয়া চুক্তির ব্যর্থতার দায়ভার সরকারের উপর বর্তায় না। মুখ্যমন্ত্রী অনৈতিক ভাবে করদাতার উপর সেই বোঝা চাপাইয়াছেন। প্রসঙ্গত, তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাউক, সিবিআই এই কেলেঙ্কারির তদন্ত করিতেছে। আমানতকারীদের টাকা ফিরাইবার দায় তাহাদের নাই। কাজেই, ‘এই বার সিবিআই টাকা ফেরত দিক’ মর্মে রাজনীতিটি, পশ্চিমবঙ্গের মানেও, বড় কাঁচা।

কমিশনে প্রায় সতেরো লক্ষ আবেদন জমা পড়িয়াছিল। তাহার এক-তৃতীয়াংশেরও কম মানুষ ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন। কমিশনের প্রধানই স্বীকার করিয়াছেন, বহু আবেদনপত্র এখনও বস্তাবন্দি পড়িয়া আছে। তাহা হইলে কীসের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ-প্রাপকদের বাছিয়া লওয়া হইল? জানিবার উপায় নাই। এই অস্বচ্ছতাই সন্দেহের জন্ম দেয়। কেহ অনুমান করিতেই পারেন, ক্ষতিপূরণ পাইবার যোগ্যতা রাজনৈতিক আনুগত্যের অঙ্কে স্থির হইয়াছে। অনুমানটি মিথ্যা, এমন দাবি করিবার কোনও উপায় কমিশনের নাই। তাঁহারাই সেই উপায় রাখেন নাই। এক্ষণে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই কমিশন যে সোজা পথে চলিবে না, তাহা ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্যামল সেন মহাশয়ের অনুমানের অতীত ছিল, এ কথা মানিয়া লওয়া মুশকিল। এমন একটি অনৈতিক, অস্বচ্ছ কমিশনের প্রধান হইতে তিনি সম্মত হইয়াছিলেন কেন?

কমিশন যে সকল আবেদনকারীকেই টাকা ফিরাইয়া দিতে পারে নাই, তাহা সুসংবাদ। কেবল রাজকোষের পক্ষে নহে, রাজ্যের ভবিষ্যতের পক্ষেও। সারদা-কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফিরাইয়া দেওয়ার খেলাটির সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক দিক ছিল, তাহা মানুষকে আরও বেপরোয়া করিয়া তুলিত। মানুষ জানিতেন, ঝুঁকির আমানতে টাকা রাখিয়া ঠকিলেও ভয় নাই— রাজ্য সরকার রক্ষাকর্তার ভূমিকা লইবে। ফলে, এই ধরনের ঝুঁকির আকর্ষণ বাড়িত, সুতরাং বিপদও। পরিণামবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিলে এই ‘মরাল হ্যাজার্ড’ তৈরি করাই সেন কমিশনের বৃহত্তম কুপ্রভাব। সকলে টাকা না পাওয়ায় তবুও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি অনিশ্চয়তা রহিল। যাঁহারা টাকা পাইলেন না, তাঁহাদের প্রতি কোনও অন্যায় হয় নাই। বরং, যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাপ্তি অন্যায়। কিছু মানুষ অন্যায় সুবিধা পাইয়াছেন বলিয়া সকলকেই তাহা দিতে হইবে, এমন দাবি বুঝি এই রাজ্যেই সম্ভব।

পুস্তক পরিচয়

অসাম্য কেন বাড়ছে, তা কমানোর পথ কী

মৈত্রীশ ঘটক

ক্যাপিটাল ইন দ্য টোয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি, টমাস পিকেটি। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৪৯৫.০০

এক সময়ের বাম রাজনীতির প্রচলিত একটা স্লোগান ব্যবহার করে বলা যায়, টমাস পিকেটি তাঁর *ক্যাপিটাল ইন দ্য টোয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি* বইটির মাধ্যমে মূল ধারার অর্থনীতির সদর দরজায় বাঁ দিক থেকে একটি কামান দেগেছেন। কামানের গোলাটি বিশাল এবং কিঞ্চিৎ জটিল। সমীক্ষায় জানা গেছে, প্রায় সাতশো পাতার তথ্য ও বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ এই বইটি কিছু দিন বেস্টসেলার লিস্টে থাকলেও, অধিকাংশ সাধারণ পাঠক এর প্রথম পরিচ্ছেদের পর আর বেশি দূর এগোননি!

বইটির বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, একটা বিষয়ে প্রগতিশীল থেকে রক্ষণশীল, সব অর্থনীতিবিদ একমত। সরকারি নানা সূত্র থেকে আয়কর, জমির দলিল এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত তথ্য একত্র করে, প্রথমে ফ্রান্স তার পর পৃথিবীর নানা দেশে (তার মধ্যে ভারত-ও আছে) আয় এবং সম্পদের বৈষম্যের দীর্ঘমেয়াদি যে তথ্যভাণ্ডার পিকেটি ও তাঁর সহকর্মীরা প্রায় দুই দশক ধরে গড়ে তুলেছেন এবং গবেষকদের ব্যবহারের জন্য অনায়াসলভ্য করে দিয়েছেন, তা যথার্থই এক মহার্ঘ সম্পদ। এ যাবৎ এই বিষয়ে যা তথ্যভিত্তিক কাজ হয়েছে (যেমন, ষাটের দশকে কুজনেটস এক জন পথিকৃৎ), দেশ ও কালের পরিধির বিস্তার এবং তথ্যসমৃদ্ধির দিক থেকে সে সবকে এই গবেষণা ছাপিয়ে গেছে।

বইটিতে প্রথমে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে অর্থনীতির কতগুলো মূল সূচকের দীর্ঘকালীন বিবর্তনের বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে আয় ও সম্পদের বণ্টন, জাতীয় আয়ে পুঁজি এবং শ্রমের আপেক্ষিক ভাগ, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার ও সুদের হার। প্রথম অংশের আলোচনায় বইটির মূল বক্তব্য হল, প্রায় এক শতাব্দীর ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেখলেও বর্তমানে আয় ও বিত্তের অসাম্যের মাত্রা খুবই বেশি, এবং তা গত প্রায় অর্ধশতক ধরে ক্রমবর্ধমান। তার আগে মহামন্দা বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ঘটনার ধাক্কায় অনেক ধনী সর্বস্বান্ত হওয়ায়, আর সরকারি নীতির কারণে (যেমন, আয়কর ব্যবস্থা ও আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রের পত্তন) ১৯৩০-এর গোড়া থেকে ১৯৬০-এর শেষ অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইয়োরোপে অসাম্য কমেছিল।

একটা দেশের সব মানুষকে আয় অনুযায়ী পর পর সাজিয়ে নিয়ে তার পর যদি দেখি যে দেশের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষ দেশের মোট আয়ের কত শতাংশ রোজগার করছেন, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ২০১০ সালে সংখ্যাটি ছিল প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। আর সেই সময়েই আয়ের ক্রমবিন্যাসের নীচের দিকে থাকা ৫০ শতাংশ মানুষ আয় করছিলেন দেশের মোট আয়ের ২০ শতাংশ। ১৯০০ সালে আমেরিকায় ওপরের ১০ শতাংশের আয়ের ভাগ ছিল এখনকার থেকে একটু কম, প্রায় ৪৬%, কিন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে তা কমে দাঁড়িয়েছিল ৩৩%। অসাম্যের ছবিটি চরিত্রগত ভাবে ইয়োরোপেও একই রকম, কিন্তু সব সময়েই তুলনায় কম তীব্র। যেমন, ২০১০ সালে ইয়োরোপের ধনীতম ১০ শতাংশ মানুষ দেশের মোট আয়ের ৩৫ শতাংশ উপার্জন করতেন।

বইটির দ্বিতীয় অবদান হল আয় আর বিত্তের এই ক্রমবর্ধমান অসাম্যের একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খাড়া করা। পিকেটি বলেছেন, এর মূলে আছে পুঁজিসঞ্চয়ের ভূমিকা। আয়ের দিক থেকে এক জন গড় নাগরিকের আয়ের বৃদ্ধির হার আর গড়পড়তা জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার কাছাকাছি হবে। কিন্তু, যাঁদের আয়ের প্রায় সবটাই পুঁজি থেকে অর্জিত সুদ, তাঁদের আয়ের বৃদ্ধির হার হবে সুদের হারের কাছাকাছি। পিকেটি দেখাচ্ছেন, সুদের হার ঐতিহাসিক ভাবে অধিকাংশ সময়ই আয়বৃদ্ধির হারের থেকে বেশি থেকেছে। সুদবাবদ অর্জিত আয়ের সিংহভাগ যদি আবার সঞ্চিত হতে থাকে, তবে স্বাভাবিক ভাবেই এই আয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। তথ্যেও দেখা যাচ্ছে, জাতীয় আয়ে পুঁজি থেকে অর্জিত আয়ের ভাগ ক্রমে বেড়েছে। পিকেটি বলছেন, যে ছবিটা এর থেকে ফুটে উঠছে, তা মেধাতন্ত্রের নয়, উত্তরাধিকার-ভিত্তিক ধনতন্ত্রের।

অসাম্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। আমেরিকার রাজপথে ‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট’ আন্দোলন।

উদারপন্থীরা বলতেই পারেন, তা-ই যদি হয়, তাতে সমস্যা কী? কেউ যদি পরিশ্রম করে ধন সঞ্চয় করেন এবং সন্তান-সন্ততিকে তার উত্তরাধিকার দিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করেন, তাতে কার কী বলার আছে? সমস্যা হল, আর্থিক অসাম্য থেকে তৈরি হয় ক্ষমতা বা প্রভাবের অসাম্য। আর ক্ষমতার অসাম্য যত বাড়ে, আদর্শ নীতি আর বাস্তবে যে নীতি অবলম্বন করা হয় এবং রূপায়িত করা হয়, তাদের মধ্যে ফারাকও তত বাড়ে। আইনি ও বেআইনি, অনেক পথে ধনীদের রাজনৈতিক প্রভাব মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র শ্রেণির মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। তাই গণতন্ত্রে প্রত্যেক মানুষের একটা করে ভোট থাকলেও, সব মানুষ নয় সমান! যেমন, আমেরিকায় আয়করের সর্বোচ্চ হার হল ৩৫ শতাংশ আর পুঁজির দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের থেকে লাভের ওপর সর্বোচ্চ করের হার হল ১৫%। তাই, প্রকৃত অর্থে এই কর ব্যবস্থা প্রগতিশীল নয়, বরং উল্টো।

পিকেটির মতে, এই অসাম্য অনিবার্য নয় এবং করনীতির মাধ্যমে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ১৯৯২ সালে আমেরিকায় সর্বোচ্চ অর্জনকারী চারশো করদাতাকে গড়ে আয়ের ২৬% কর দিতে হত। প্রেসিডেন্ট বুশের করের হার কমানোর নীতির ফলে ২০০৯ সালে এই হার কমে দাঁড়ায় ২০%। যা কমানো যায়, তা বাড়ানোও যায়। ইয়োরোপে অসাম্যের মাত্রা আমেরিকার তুলনায় কেন কম, তার সহজ উত্তর হল, করের হারের ফারাক। পিকেটির প্রস্তাব, পুঁজি থেকে অর্জিত আয়ের ওপর কর আদায় করা হোক, এবং পুঁজি যেহেতু সচল, তাই সব দেশেই সেটা এক হারে করা হোক।

এই প্রস্তাব বাস্তবসম্মত কি না, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। সেই রকম, তাঁর তত্ত্ব যে অভ্রান্ত বা সর্বাঙ্গীণ, তাও বলা যায় না। পিকেটি নিজেই হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, গত চার দশকে আমেরিকায় আয়ের সার্বিক অসাম্যের বৃদ্ধিতে পুঁজি-লব্ধ আয়ের অবদান এক-তৃতীয়াংশের বেশি নয়, যা তাঁর পুঁজি-কেন্দ্রিক তত্ত্বের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না। এখানে দক্ষ শ্রম থেকে অর্জিত আয়ের ক্রমবর্ধমান অসাম্যের একটা বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়, যেমন ম্যানেজার বা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কারের আয় সাধারণ শ্রমিকের মজুরির তুলনায় প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে।

তা হলেও, আয় ও বিত্তের ক্রমবর্ধমান অসাম্য নিয়ে পিকেটি যে গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ পেশ করেছেন, তা থেকে বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন মূলধারার অর্থনীতির সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েছে। এই প্রথম দেখছি, অসাম্যের প্রসঙ্গটি এমনকী রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদদের গবেষণাতেও বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে বলে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

বহুপঠিত কি না তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও, বহুচর্চিত এই বইটির আপাত-জনপ্রিয়তার কারণটা ভেবে দেখা দরকার। সাম্প্রতিক আর্থিক সংকট এবং তাতে ব্যাঙ্ক আর বিনিয়োগ সংস্থাগুলোর ভূমিকা অতি-ধনীদের প্রতি সাধারণ নাগরিকদের মনে এক গভীর বিরূপতা তৈরি করেছে। আমেরিকায় আর্থিক বৈষম্য নিয়ে সামাজিক মনোভাব অনেকটাই পাল্টে গেছে— ‘ওপরের এক শতাংশ’ কথাটা এখন খুবই চালু। করদাতাদের টাকায় ব্যাঙ্কের লালবাতি জ্বলা আটকাতে হবে, এই রকম ধনীদের জন্যে ‘জিতলে ধনতন্ত্র, কিন্তু হারলে সমাজতন্ত্র’ মানসিকতার ফলে জনমানসে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এর আগে আমেরিকায় রাজনীতিকরা ‘করবৃদ্ধি’ শব্দটি ব্যবহার করতে ভয় পেতেন। এখন সেই অবস্থা খানিকটা হলেও পাল্টেছে।

আসলে, অসাম্যের প্রশ্নের সঙ্গে ন্যায়ের প্রশ্নটা অঙ্গাঙ্গী জড়িত। স্থান, কাল ও পরিস্থিতিভেদে কতটা অসাম্য সামাজিক ভাবে সহনীয় বা বৈধ, অসাম্যের বিরুদ্ধে নীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শেষ বিচারে সেটাই বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্-এ অর্থনীতির শিক্ষক

আয় ও বিত্তের ক্রমবর্ধমান অসাম্য নিয়ে পিকেটি যে নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ পেশ করেছেন, তা থেকে বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন মূলধারার অর্থনীতির সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েছে।

বেস্টসেলার

গল্প-উপন্যাস

১. **প্রাণসখা বিবেকানন্দ**, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রভারতী (১)
২. **ব্যোমকেশ সমগ্র**, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দ (-)
৩. **কাদম্বরী দেবীর সুইসাইড নোট**, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রভারতী (৩)
৪. **বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র**, বনফুল। বাণীশিল্প (-)
৫. **রূপমঞ্জরী**, নারায়ণ সান্যাল। দে’জ (-)
৬. **মুহূর্তকথা**, বুদ্ধদেব গুহ। পারুল (-)
৭. **দশটি উপন্যাস**, সুচিত্রা ভট্টাচার্য। আনন্দ (-)
৮. **সাতটি রহস্য উপন্যাস**, শেখর সেনগুপ্ত। প্রিটোনিয়া (-)
৯. **সেরা দশটি উপন্যাস**, বুদ্ধদেব গুহ। সাহিত্যম্ (-)
১০. **আটটা-ন’টার সূর্য**, অশোককুমার মুখোপাধ্যায়। দে’জ (১০)

অন্যান্য

১. **গীতা কালে কালান্তরে**, বরুণকুমার চক্রবর্তী। পারুল (১)
২. **আশ্চর্য বিবেকানন্দ**, শংকর। দে’জ (২)
৩. **বিনয় মজুমদার: অনুধ্যানে অনুভবে**, অমলকুমার মণ্ডল সম্পাদিত। কবিতীর্থ (-)
৪. **রাজপুর-সোনারপুর অতীত ও ঐতিহ্য ২**, সম্পাদনা: জীবন মুখোপাধ্যায়। পরি: প্রগ্রেসিভ (-)
৫. **খাজুরাহো**, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত। পত্রলেখা (-)
৬. **গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য**, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। কারিগর (-)
৭. **আমাজনের জঙ্গলে**, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। স্বর্ণাক্ষর (-)
৮. **শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধান রহস্য**, দেবাশিস পাঠক। দীপ (-)
৯. **গোপাল ভাঁড় অমনিবাস**, সঞ্জিতকুমার সাহা। গ্রন্থমিত্র (-)
১০. **নানা চর্চা**, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। অভিযান (১০)

‘কাজের মধ্যে তিনি হৃদয় দিয়েছেন’

উনিশ শতকের বঙ্গসমাজে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে নিশ্চয়ই সে সময়টা উঠে এসেছে, তবে আরও বেশি উঠে এসেছে তাঁর পত্রাবলিতে। *প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী*-তে (পত্রপরিচিতি ও টীকা: জ্যোতির্ময় সেন। অলকানন্দা পাবলিশার্স, ২০০.০০) তাই সমকাল ও পরবর্তী কালের বহু ঘটনা সমাজ-সম্পৃক্ত মহর্ষির জীবনটাকে অনেকটাই উন্মোচিত করে। ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট মানুষজনকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে তাঁদের নীতি, কর্মধারা, সামাজিক অবস্থানের একটা চেহারা উঠে আসে। বন্ধু সুহৃদ নিকটজনদের এই চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল কলকাতা, শান্তিনিকেতন, শিলাইদহ, অমৃতসর, সিমলা, বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে। এই পত্রাদি সংগ্রহ করে একদা প্রকাশ (১৯০৯) করেন মহর্ষির পার্ষদ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। বর্তমান সংস্করণে টীকাসহ পত্র-পরিচিতি সংযোজিত।

‘বিদ্যাবুদ্ধির সম্বল অনেকেরই থাকে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে কীর্তিলাভ করতেও পারেন অনেকে, কিন্তু জগদানন্দের সেই দুর্লভ গুণ ছিল যার প্রেরণায় কাজের মধ্যে তিনি হৃদয় দিয়েছেন। তাঁর কাজ আনন্দের কাজ ছিল, শুধুই কেবল কর্তব্যের নয়। তার প্রধান কারণ, তাঁর হৃদয় ছিল সরস, তিনি ভালোবাসতে পারতেন।’— রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৭) সম্পর্কে। সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমে পরিচয়, পরে আশ্রমের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষকও হন। সম্প্রতি সুবিমল মিশ্রের সম্পাদনায় প্রকাশ পেল *শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়: জগদানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ* (পরি: দে বুক, দে’জ, ৩৫০.০০)। তাঁকে লেখা কবির চিঠিপত্রের সঙ্গে আছে তাঁর লেখালেখি সংক্রান্ত তথ্য, তাঁর গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জি, রচিত বইপত্রের ভূমিকা। আছে তাঁকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নন্দলাল বসু প্রমুখের রচনাদিও। আর আছে তাঁর নিজের স্মৃতি, তাতে জগদানন্দ লিখছেন: ‘একবার আমাদের মধ্যে স্থির হইল, সাধারণ বাক্যালাপে ইংরাজি শব্দ একেবারে ব্যবহার করা হইবে না; ব্যবহার করিলে প্রত্যেক শব্দের জন্য এক পয়সা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। গুরুদেবও এই খেলায় যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাকে কিন্তু জরিমানা দিতে হয় নাই।’

বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র থেকে রতনকুমার নন্দী ও পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বেরল *বঙ্কিম অভিধান (প্রবন্ধ খণ্ড। ২৫০.০০)*। অভিধানের প্রথম খণ্ডে ছিল উপন্যাস। বঙ্কিম-ভবন-এর অধ্যক্ষ পিনাকেশচন্দ্র সরকারের মতে ‘বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনার বিষয়গত বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখেই বর্তমান খণ্ডের পরিকল্পনা।’ বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানরাজ্যের অতলস্পর্শী গভীরতা উপন্যাসসমূহের মতো তাঁর লেখা বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধাদিতেও। পড়তে-পড়তে মনে হতেই পারে সেগুলি সটীক হলে ভাল হত। সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই করেছেন সম্পাদকদ্বয়, তাঁরা জানিয়েছেন ‘অভিধানে শব্দ-সংকলন (এন্ট্রি) হিসাবে ব্যক্তিনাম, স্থাননাম, ঐতিহাসিক চরিত্র, গ্রন্থনাম, পৌরাণিক চরিত্র, পৌরাণিক প্রসঙ্গ, বিশেষ ঘটনা, জ্যোতির্বিজ্ঞান বা জ্যোতিষ সম্পর্কিত বিষয় যেমন এসেছে, তেমনই চয়ন করা হয়েছে বর্তমানে অপ্রচলিত বেশ কিছু শব্দ। আর এর পাশাপাশি এসেছে অজস্র সংস্কৃত শব্দ ও শ্লোক।’

নতুন করে প্রকাশ পেল শ্যামলী চক্রবর্তীর *বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ* (অক্ষর, ২৫০.০০)। সূচনা-য় নিজের কাজের হদিশ দিয়েছেন শ্যামলী: ‘বঙ্কিমের উপন্যাসের অনেক ঘটনা ও চরিত্রের পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে অবশ্যম্ভাবী। উপন্যাসে ব্যবহৃত শিল্পবিষয় শিল্পপ্রসঙ্গ গান ও গানের প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা বিচার বিশ্লেষণের আলোয় বঙ্কিম ও তাঁর সৃষ্টির জগৎ নতুন রূপে ও তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে।’ আর মুখপাত-এ সুধীর চক্রবর্তী জানাচ্ছেন ‘বঙ্কিমচন্দ্রের সংগীতের জগৎ তাঁর সারস্বত সাধনারই অন্তর্গত ছিল।... একজন গীতিকার একটি মাত্র গান রচনা করে স্পর্শ করে গেলেন চরম সংগীতের গভীরতা এবং হয়ে থাকলেন এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব এমন সংঘটন আগে দেখা যায়নি।’

অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘বড়োদাদামশায়’ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে ধারাবাহিক লিখেছিলেন *দেশ* পত্রিকায়। সেটি *গগনেন্দ্রনাথ* নামে বই হয়ে প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৭৩-এ। সে বইয়ের ভূমিকা-য় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন ‘কিউবিজম্‌কে তার নক্‌শা সর্বস্ব আড়ষ্টতা থেকে উদ্ধার করে গগনেন্দ্রনাথ তাকে ভাব-ধর্মী ও আবেগ-ধর্মী করে তুললেন।’ বইটি পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দে’জ (১৫০.০০) থেকে পুনরায় প্রকাশ পেল। যোগ হয়েছে গগনেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, প্রাসঙ্গিক তথ্য; রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের মাধুর্যময় সম্পর্কের বিবরণ; গগনেন্দ্রনাথের গ্রন্থ ও চিত্রপঞ্জি, বংশলতিকা; সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়; সঙ্গে মোহনলাল ও তাঁর রচনা সম্পর্কিত তথ্যাদি-আলোচনা।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের *ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: ইতিহাসবোধ ও রাষ্ট্রচিন্তা*-র (অনুষ্টুপ, ১৫০.০০) নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ পেল। এই সংস্করণটির ভূমিকা-য় লেখক জানিয়েছেন ‘যোগ হয়েছে অনেক... প্রাক্তন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মহাফেজখানা গবেষকদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তথা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ সম্পর্কে অনেক দলিলপত্র এর ফলে পাওয়া গেল।’ ভূপেন্দ্রনাথের (১৮৮০-১৯৬১) জীবনী নয়, তাঁর সমকালে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ও রাজনৈতিক চিন্তাজগতে তাঁর অবদান নিয়েই লিখেছেন রামকৃষ্ণ। তাঁর মতে, দু’টি বড় কৃতিত্বের দাবিদার ভূপেন্দ্রনাথ— এক, এ দেশের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে তিনিই প্রথম শ্রেণিসংগ্রাম ও সমাজবাদের কথা তোলেন। দুই, প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই প্রথম মার্কসবাদ প্রয়োগ করেন।

আঙ্গিকের মাধ্যমেই ব্যক্ত হয় উষ্মা ও জোরালো প্রতিবাদ

সম্প্রতি মায়া আর্ট স্পেসে অনুষ্ঠিত হল ‘বাংলা কার্টুন’ শীর্ষক একটি প্রদর্শনী। লিখছেন মৃণাল ঘোষ

চিত্রকলা ও ভাস্কর্য

কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র বা কৌতুক-নকশা যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এই চিত্র-আঙ্গিকটির অন্যতম উদ্দেশ্য হাস্যরস সৃষ্টি। নির্মল, সশ্রদ্ধ হাস্যরসের উপস্থাপনা যেমন এর একটি উদ্দেশ্য, তেমনই এই আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে শিল্পী তাঁর উষ্মা এবং তীব্র প্রতিবাদও ব্যক্ত করেন। প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ কার্টুনের প্রধান একটি উদ্দেশ্য। কার্টুন রচনার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে স্বাভাবিকের বিকৃতিকরণ বা ডিস্টরশন। যা স্বাভাবিক, তা সব সময় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। স্বাভাবিককে ভাঙলে সেই আপাত-বিকৃতি সত্যকে প্রকট করে তুলতে পারে। এক সময় ‘কার্টুন’ অভিধাটি বৃহত্তর চিত্রের পূর্ববর্তী নকশা হিসেবেও গণ্য হত। রাফায়েল সিস্টিন চ্যাপেলের জন্য এ রকম সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতাবাদী উপস্থাপনায় বাইবেলের আখ্যানের প্রাথমিক খশরা করেছিলেন, যা পরে ট্যাপেস্ট্রিতে রূপান্তরিত হওয়ার কথা ছিল। এ রকম স্বাভাবিকতাবাদী রূপায়ণকে অবশ্য আজ আর কেউ কার্টুন বলে না।

মায়া আর্ট স্পেস গ্যালারিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল ‘বাংলা কার্টুন’ শিরোনামে প্রদর্শনী। পরিকল্পনা ও বিন্যাস করেছেন দেবদত্ত গুপ্ত। প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হয়েছে ১৮৭২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পত্রিকা বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কার্টুনের বিবর্তন। এ বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল পথিকৃৎ। এই প্রদর্শনীর প্রথম কার্টুনটি এই পত্রিকার ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ সংস্করণ থেকে নেওয়া। একজন ইংরেজ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের অশ্ব ও অশ্বচালক নিয়ে নির্মল কৌতুক। সঙ্গে চার লাইনের একটি বাংলা কবিতাও রয়েছে। স্বাভাবিকতাবাদী কার্টুনের আর একটি ধরন দেখা যায় ‘ভারতী’ পত্রিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের একটি ছবিতে। শিরোনাম ‘রঙ্গালয়ের মহাদেব’। উপশিরোনামে ছবিটির বর্ণনা রয়েছে এ রকম ‘হস্তে টিনের ত্রিশূল, ভালে পঞ্চবর্তিকা শক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রিক ভাল্‌ব সহযোগে মদনভস্ম করিলেন’। এখানেই কৌতুকের মধ্য দিয়ে পুরাণকল্প ও আধুনিকের সমন্বয় ঘটল।

অভিব্যক্তিবাদী বাংলা কার্টুনের প্রধান পথিকৃৎ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৎকালীন নানা সামাজিক অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গচিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি যে ভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন, সামাজিক তাৎপর্যের দিক থেকে, কার্টুনের নান্দনিকতার দিক থেকেও তার স্বাতন্ত্র্য অবিসংবাদিত। এই প্রদর্শনীতে আমরা দেখি ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ১৩২৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত একটি ছবি। তাতে এক স্কুলমাস্টার একটি পাখিকে বলছেন: ‘পাখী তোর বসন্তের গান থামা, পড় বসে A B C D’। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের বিচ্ছিন্নতাকে কশাঘাত করেছেন শিল্পী। তাঁর ব্যঙ্গচিত্র সংকলন ‘বিরূপ বজ্র’ (১৯১৭), ‘অদ্ভুত লোক’ (১৯১৭), ‘নব হুল্লোড়’ (১৯২১) কার্টুনের জগতে দিকচিহ্ন স্বরূপ। এর কিছু কিছু ছবির প্রতিলিপি প্রদর্শনী কক্ষের ভিতরে ও বাইরে ছড়ানো ছিল। ‘প্রবাসী’তে ১৩২২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত অসিতকুমার হালদারের জলরঙের ছবিটিতে রন্ধনরতা গৃহবধূ ও শাশুড়ির ছবিটিকে সঠিক অর্থে কার্টুন বলা যায় কি না এ বিষয়ে সংশয় থাকে। এতে রূপাবয়বের ভাঙন নেই, ব্যঙ্গ বা কৌতুকও নেই।

সমসাময়িক কালে কল্পরূপাত্মক ভাঙনের মধ্য দিয়ে কৌতুক নকশা সৃষ্টিতে সুকুমার রায় ছিলেন অতুলনীয়। ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৯২৯) প্রকাশিত তাঁর একটি কৌতুক-নকশায় তিনি তাঁর রচনার ধরন ব্যক্ত করেছেন এ ভাবে ‘ছবির টানে গল্প লিখি নেইক এতে ফাঁকি/ যেমন ধারা কথায় শুনি হুবহু তাই আঁকি’। সামাজিক দায়বোধে দীপ্ত প্রতিবাদী কার্টুনের দুই পথিকৃৎ শিল্পী চিত্তপ্রসাদ ও সোমনাথ হোর। তাঁদের কার্টুন প্রকাশে ‘জনযুদ্ধ’ পত্রিকাটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এছাড়াও বহু শিল্পী কাঁফি খান, শৈল চক্রবর্তী, রেবতীভূষণ, পি. কে. এস. কুট্টি, রঘুনাথ গোস্বামী, চণ্ডী লাহিড়ি, অহিভূষণ মালিক প্রমুখ। রেবতীভূষণের একটি কার্টুনে দেখা যাচ্ছে ইজেলের উপর কালো ক্যানভাস দাঁড় করানো। তাতে সাদা রেখায় আঁকা রয়েছে ফুল ও সাপের ছবি। নীচে লেখা ‘বাজেট ৮৩-৮৪’। সামনে দর্শক, পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন শিল্পী। উপরে লেখা ‘এই দেখ না আমি কেমন ছবি এঁকেছি’। বাংলা কার্টুনের জগৎ ক্রমান্বয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

শিল্পী: রেবতীভূষণ

মানব-মানবীর মিলনদৃশ্য

দেবীরানি দাশগুপ্তের তৃতীয় একক প্রদর্শনী হল সম্প্রতি অ্যাকাডেমিতে। নিজস্ব প্রয়াসে শিখেছেন। আলোচ্য প্রদর্শনীতে তাঁর অ্যাক্রিলিকে আঁকা প্রায় ২০টি ছবি ছিল। রাধাকৃষ্ণের সনাতন পুরাণকল্প ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি ছবিতে তিনি এঁকেছেন মানব-মানবীর মিলনদৃশ্য। লৌকিকের পরোক্ষ এক আবহ তাঁর ছবিতে আছে। উজ্জ্বল বর্ণ ও অলঙ্করণের আধিক্য তাঁর রূপায়ণের একটি বৈশিষ্ট্য। এই আধিক্যের জন্য তাঁর ছবি অনেক সময় ভারী হয়ে গেছে। পরিসর ও প্রতিমাবিন্যাসে নান্দনিক অবকাশ তেমন গুরুত্ব পায়নি। নব্য-ভারতীয় চিত্ররীতির আবহকে তিনি সাম্প্রতিকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়াস প্রশংসনীয়।

মৃ ঘো

প্রদর্শনী

চলছে

সিমা: ■ গণেশ পাইন ২২ নভেম্বর পর্যন্ত।
তাজ বেঙ্গল: ■ নুর আলি কাল শেষ।
অ্যাকাডেমি: ■ প্রদীপ, বিমান প্রমুখ ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত।
■ পার্থ মণ্ডল ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত।
■ অশোক, বরুণ প্রমুখ ২৭ পর্যন্ত।
■ সঞ্জয়, তন্ময় প্রমুখ ২৭ পর্যন্ত।
■ ‘ক্রিয়েটিভ পেইন্টার্স গ্রুপ’-এর প্রদর্শনী ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত।
গ্যালারি গোল্ড: ■ গীতশ্রী সাহা ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত।